মুসলিমদের জামাআত
ও তৎসংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন

ইমামুল মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ

আলোর বাতিঘর

সিরিজ-০৩

AN-NASR

আলোর বাতিঘর

পর্ব – ৩

মুসলিমদের জামাআত ও তৎসংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন

ইমামুল মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও পরিবেশনা

AN-NASR

-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

قناديل من نور (الحلقة الثالثة) : جماعة المسلمين وأسئلة متفرقة –للشيخ أسامة بن لادن – رحمه الله

ভিডিও দৈর্ঘ্য: ১:৩০:১৮ সেকেন্ড

প্রকাশের তারিখ: শাবান, ১৪৩৯ হিজরি

প্রকাশক: আস সাহাব মিডিয়া

আলোচ্য বিষয়:

(১) যুগের চাহিদা ও এর আলোকে আমাদের ফরজ দায়িত্বসমূহ।

(২) আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করে কাফিরদের শক্তিকে পদদলিত করতে পূর্ণ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানবজাতিকে 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল' - তাওহীদের এই কালিমার প্রতি আহবান করার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। এ দু'টি বাক্যই ইসলামের মূল ভিত্তি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুরু করে সকল নবী আলাইহিস সালাম এই কালিমার দাওয়াত নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন।

পৃথিবী থেকে আল্লাহর এই কালিমার আলো মুছে গেলে পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়বে কুফর ও জুলুমের অন্ধকার। যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কালিমা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তাই তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন ও কুরাইশ গোত্রকে এই কালিমারই দাওয়াত দেন এবং ঘোষণা করেন:

قولوا لا إله إلا الله تفلحوا

"তোমরা বলো; আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তবেই তোমরা সফলকাম"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালিমার এই রোকনকে আঁকড়ে ধরে প্রায় একযুগ কুরাইশকে ইসলামের এই মূল ভিত্তির দিকে আহবান করেছেন।

আর এই মজবুত রোকন অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে মৌলিক কিছু মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে। যাঁরা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দ্বীনকে সকল বাতিল মতবাদের উপর বিজয়ী করতে চায় এবং মানবজাতির জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু সব কিছুকেই ইসলামী নীতির আলোকে পরিচালনা করতে চায়, তাদের জন্য একমাত্র পদ্ধতি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্ তথা তার রেখে যাওয়া পথ ও পন্থা।

সকল সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা; যিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি অধিক অবগত যে, কর্তৃত্ব, শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া আহবান করা হলে কোন ব্যক্তি সেই আহবানে সাড়া দিবে না। যখন কর্তৃত্ব, শক্তি ও ক্ষমতা থাকবে তখন মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের অন্যান্য রোকনের প্রতি আদেশের পূর্বে এই

কালিমাকে সাহায্যকারী একটি শক্তি হিসেবে ও একটি ক্ষমতাশীল দলের সন্ধান করতে শুরু করেন।

এই উদ্দেশ্যে তিনি হজ্জ মৌসুমে ও অন্যান্য সভা-সমাবেশে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের নিকট উপস্থিত হতেন। তারা তাঁর কাছে এসে বলতো, "হে কুরাইশী ভাই! আপনি কোন বিষয়ের দিকে মানুষকে আহবান করছেন"? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আর আমি তাঁর রাসূল" - আমি মানুষকে এই কথার সাক্ষ্য দেয়ার প্রতি আহবান করছি। আর তাদের বলি যে, আপনারা আমাকে আশ্রয় দিন, নিরাপত্তা দিন, আর এমনভাবে আমাকে সাহায্য করুন; যেভাবে আপনারা নিজেদের সন্তানদের ক্ষেত্রে করে থাকেন"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাগুলো আল্লাহর পথে দাওয়াত এবং পৃথিবীতে হক প্রতিষ্ঠিত করার পথ ও পদ্ধতি জানার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অত্যাবশ্যকীয় পাঁচটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে, ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ রোকনগুলো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে ।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনি প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা তাওবা, ৯ : ৩৩)

তাই তিনি গোত্রীয় দলগুলো থেকে নুসরাত ও আশ্রয় তলব করার কারণ হিসেবে বলতেন:

حتى أبلغ رسالة ربي

"এই নুসরাত ও আশ্রয় আমার রবের বার্তা পৌঁছানোর অবধি পর্যন্ত"।

আল্লাহর বার্তা মানব জাতির কাছে পৌঁছানোর জন্য স্বতন্ত্র শক্তির ও ক্ষমতার প্রয়োজন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক শক্তিশালী বাহিনীর সন্ধান করতেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে - সত্যের বাস্তবায়ন, মিথ্যার বিলুপ্তি এবং মোড়ল কুফফারদের শক্তি থেকে মুসলিমদের রক্ষা করার একমাত্র পদ্ধতি হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার মৌলিক পাঁচটি খুটির একটি হলো জিহাদ। তাই হারিস ইবনে হারিস আশআ'রী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়ার কাছে পাঁচটি বাণী ওহীরূপে প্রেরণ করেছেন এই মর্মে যে, তিনি নিজে এগুলো অনুযায়ী আমল করবেন এবং বনী ইসরাঈলকে তার প্রতি নির্দেশ দিবেন। আল্লাহ তায়ালা এই বাণীগুলো কেবল আলোচনার জন্য অবতীর্ণ করেন নি বরং তা অনুযায়ী আমল করার জন্য দিয়েছেন।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সম্মুখে এই পাঁচটি বাণী উল্লেখ করলেন, যেগুলোর প্রত্যেকটিই দ্বীন প্রতিষ্ঠার মূল স্তম্ভ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; "আল্লাহ আমাকেও পাঁচটি বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন; যার নির্দেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি"।

ইসলামের পাঁচটি রোকন ও পাঁচটি বাণী একটি অপরটির পরিপূরক। নিম্নোল্লেখিত পাঁচটি নির্দেশ হলো ইসলামের মূলনীতি। আর ইসলামের রোকনসমূহের প্রতিষ্ঠা এই পাঁচটি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। সাধারণত যে কোন জিনিসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় কিছু মূলনীতি ও রোকনের উপর। তেমনি দ্বীনের জন্যও পাঁচটি মূলনীতি ও পাঁচটি রোকন জরুরী। যেই পাঁচটি মূলনীতির অনুসরণের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হলো:

أنا آمركم بخمس أمرني الله بهن – (اسمعوا ووعوا واحفظواها-) الجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله .

“আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করছি, যে পাঁচটি বিষেয় আমি আদিষ্ট হয়েছি। জামাতবদ্ধ হওয়া, শ্রবণ করা, আনুগত্য করা, হিজরত করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা”। (আবু দাউদ-১২৫৮)

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের বলছি, এই পথের জন্য, শ্রবণ ও আনুগত্যের ভিত্তিতে একটি সুসংহত মুসলিম জামাআত প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রয়োজন হলে হিজরত এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে হবে। এই মূলনীতিগুলোর অনুসরণ ছেড়ে, মুসলিম উম্মাহর মধ্য হতে যে বা যারা দ্বীনের বিজয়ের মেহনত করেছে; আমি বলবো, তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসৃত পথ সম্পর্কে অবগত নয়।

পূর্বের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর আমি বলবো; বর্তমানে আমরা বিশ্বাস করি যে, কুরআন, সুন্নাহর নুসূসসমূহে যে ধরণের জামাতের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে, তারা হলো আফগানিস্থানের তালেবানকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ পালনার্থে প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে এই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিৎ যে, আমীরুল মু’মিনিনই হলেন, শরয়ী আমীর।

সহিহ বুখারী ও মুসলিমে হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: সাধারণত লোকজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো। আর আমি অনিষ্টে পতিত হওয়ার আশংকায় তাকে অনিষ্টতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! পূর্বে আমরা অজ্ঞতা ও অনিষ্টে লিপ্ত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ এই কল্যাণ ধর্ম তথা ইসলাম দান করেছেন। তো এই কল্যাণের পর পুনরায় কি কোন অনিষ্টতা আসবে”? তিনি বললেন, “হ্যাঁ।“ তারপর পুনঃরায় জিজ্ঞেস করলাম, “এই অনিষ্টের পর কি আবার কোন কল্যাণ আসবে”? তিনি বললেন, “হ্যাঁ, কিন্তু ঐ সময়ে ‘দাখন’ থাকবে”। আমি বললাম, “‘দাখন’ কী”? তিনি বললেন, “‘দাখন’ হলো এমন সম্প্রদায়, যারা আমার অনুসৃত পথ ছাড়া মানুষকে পথ প্রদর্শিত করবে। তুমি তাদের চিনবে এবং অস্বীকার করবে”। তাকে পুনঃরায় জিজ্ঞেস করলাম, “এই কল্যাণের পর আর কোন অনিষ্টতা আছে”? তিনি বললেন, “হ্যাঁ আছে। এমন কিছু আলিম আসবে, যারা জাহান্নামের

পথে আহবান করবে। যেই তাদের ডাকে সাড়া দিবে সে জাহান্নামে পতিত হবে"। (এসকল পথচ্যুত আলিমদের থেকে আল্লাহর পানাহ চাই)

এই হাদিস নিয়ে আমাদের তাদাব্বুর করা জরুরী। হাদিসটি বর্তমান মুসলিমদের অবস্থার চিত্রায়ন করছে। শাসকশ্রেণী তাদের বিভিন্ন সংস্থা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহবান করছে। তারা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দিন-রাত পাপাচারিতা ও কুফুরের দিকে প্ররোচিত করছে। (লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)। বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতে এমন এক নিকৃষ্ট প্রজন্মের আবির্ভাব হয়েছে, যা অতীতে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। এই নামমাত্র মুসলিম দাঈদের কর্মের শেষ ফল জাহান্নামের দিকেই .....।

হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জিজ্ঞেস করলেন যে, "এই কল্যাণের পর আর কোন অনিষ্টতা আছে"? তিনি উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, জাহান্নামের দিকে আহবানকারী কিছু পাপিষ্ঠ দাঈ আছে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে"। তখন আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন"। তিনি বললেন, "তাদের চামড়া হবে আমাদের চামড়ার মতো, তারা আমাদের ভাষায় কথা বলবে"। আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে এ ধরণের ফিতনার সম্মুখীন হলে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দিন"।

হাদিসে উল্লেখিত **أمر** শব্দটা ওয়াজিবের জন্য এসেছে। হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু "আপনি আমাকে এ ধরণের ফিতনার সম্মুখীন হলে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দিন!" এই প্রশ্ন করে আমাদের সামনে সঠিক পথকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। দ্বীনের বিষয়ে অনেক সংক্ষেপ করে দিয়েছেন। কারণ; ইসলামের ফরয বিধান, ইসলামের শাখা-প্রশাখা তো অসংখ্য। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: ঈমানের ষাটটি শাখা রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঈমানের সত্তরটি শাখা রয়েছে। সর্বোত্তম বা সর্বপ্রথম শাখা হলো;

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّهِ

“আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল”।

সর্বশেষ শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

এখন আমাদের বুঝতে হবে যে, **لا إله إلا الله** এর সাক্ষ্য দেয়ার মতো মৌলিক রোকন বিলুপ্ত থাকা অবস্থায় ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা, তথা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা কিছুতেই ঠিক হবে না। অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রেও এই কথা।

অর্থাৎ মূল শাখা ছেড়ে ছোট-খাটো শাখার পিছনে ছুটে চলা ঠিক নয়। যারা এমনটি করে, তারা আল্লাহর আদিষ্ট শরয়ী আবশ্যকীয় বিধান থেকে সড়ে যায়। তাই সর্বপ্রথম আমরা **لا إله إلا الله** এর সাক্ষ্য দানের আহবান করি। কেননা মূল বিষয় নিঃশেষ হয়ে গেলে এর স্থান দখল করে নিবে আমেরিকা, ফ্রান্স এবং ইংরেজদের বানানো তাগুতী শাসন; যে শাসনব্যবস্থা মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধির ময়লা মাত্র।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআ’য রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় নিম্নোক্ত নির্দেশনা দিয়েছিলেন -

فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا ا

“তুমি সর্বপ্রথম তাদেরকে যে বিষয়ের দিকে আহবান করবে তা হলো; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্য দেয়া”।

কারণ ভিত্তি মজবুত না হলে তো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যায় না। তো হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: “আপনি আমাকে এ ধরণের ফিতনার সম্মুখীন হলে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দিন!”

তখন রাসূল তাকে অনেকগুলো শাখার মাঝে একটি শাখাকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশিত বিষয়টি যুগের চাহিদা এবং উম্মতের উপর ফরয দায়িত্ব এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর উপর দ্বীনের ভিত্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সেই

ঐতিহাসিক প্রশ্নের জবাবে বললেন: 'তুমি মুসলিমদের জামাত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'।

এটি হলো বর্তমান মুসলিম উম্মাহ থেকে হারিয়ে যাওয়া ফরয। তো এই পথে পৌঁছার উপায় কী? বর্তমানে আমরা কিভাবে ইসলামের সাহায্য করতে পারি? অথচ মুসলিমরাই আজ অমুসলিমদের দলভুক্ত হয়ে আছে। পুরো বিশ্বে মুসলিমদের শাসকরা প্রকাশ্যে ইসলাম পরিপন্থী কাজে লিপ্ত। শুধু তাই নয়, বরং তারা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের স্থানীয় এজেন্ট হয়ে কাজ করছে। তারাই মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার কার্য পরিচালনা করছে। সুতরাং কিভাবে এই ধরণের গোমরাহ্ এবং পথভ্রষ্টকারী শাসকদের আনুগত্য করে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে? (লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করার পরও আবু জাহেল ও মক্কার কুরাইশ কুফফারদের নেতৃত্বে জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতো। অথচ তাদের অবস্থান ছিলো আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দনীয় ভূমি মক্কায়, যেখানে (বাইতুল্লায়) এক রাকাত নামাযে একলক্ষ রাকাতের প্রতিদান পাওয়া যায়। লোকগুলো অন্তর থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহ তায়ালাকে ইলাহ, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এই বিশ্বাস স্থাপনের পরও কী লাভ হলো?

তারা মুসলিম জামাআতের সাথে মিলিত হয়নি বরং মক্কার সমতল ভূমি, পরিবার, পরিজন তাদের হিজরত করা থেকে পিছিয়ে রেখেছে। এক পর্যায়ে মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে যখন যুদ্ধ সংগঠিত হলো, তখন এই লোকগুলো নিজ উদ্যোগে নয় বরং বলপ্রয়োগের কারণে, বীরবেশে নয় বরং কুফফারদের চাপে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে বের হয়েছে। তাদের লক্ষ্য ছিলো মুশরিকদের দল ভারী করা, অথচ তাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু এই মুহাব্বত আল্লাহর নির্দেশিত স্তরে পৌঁছেনি। তাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিপ্রায় না থাকা সত্ত্বেও মুশরিকদের চাপে দল ভারী করার জন্য মুসলিম বাহিনীর বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

পরবর্তীতে এই লোকগুলো কুফরের পতাকার নিচে নিহত হওয়ায় কিছু সাহাবী সংকোচবোধ করে বলা শুরু করলেন; আমরা তো আমাদের ভাইদের হত্যা করেছি এবং এই ভাবনায় তারা আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করতে লাগলেন। কারণ তারা বুঝতে পারেননি যে, কুফরের ছায়াতলে আশ্রিত এবং তাদের সাথে অবস্থানকারী ব্যক্তিরাও সমান অপরাধী।

উপরোক্ত ঘটনাটি ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তাঁর সহিহুল বুখারীতে সাহাবায়ে কেরামের সূত্রে বর্ণনা করেন। আর ঐ সময় আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের উপর থেকে একটি আয়াত নাযিল করলেন, যে আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হবে। ঐ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিরকের ছায়াতলে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান”। (সূরা নিসা ৪ : ৯৭)

তো ইসলাম ধর্ম যে কোন মুসলিমের জন্য শিরকের ছায়াতলে (দারুল হরবে) অবস্থান করাকে প্রত্যাখ্যান করে। বরং শিরক থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ইবাদত করতে দ্বীন নিয়ে হিজরত করা জরুরী। বাপ-দাদার ভূমি স্বীয় জন্মস্থানকে আঁকড়ে ধরার জন্য আমাদের সৃষ্টি নয়, বরং আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন মাজিদে ঘোষণা করেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি”। (সূরা যারিয়াত, ৫১:৫৬)

আল্লাহর ভূমি অনেক বিস্তৃত। তাই আল্লাহর কালিমা **لا إله إلا الله** কে সমুচ্চ করতে, প্রয়োজনে আমরা হিজরত করবো। আমরা এমন এক যুগে এসে পৌঁছেছি, যেখানে সৎ-অসৎ সকল মুসলমানের অন্তরে লাঞ্ছনা, ভীরুতা ও হীনমন্যতা জন্ম নিয়েছে। তাই তারা পূর্বের সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভয় পেতো। তো আল্লাহ আমাদের ভাইদেরকে হিজরত ও তার রাস্তায় জিহাদের তাওফিকের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন। তাই আমরা আপনাদের বয়সে অথবা তার চেয়েও কম বয়সে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হয়েছি। আর তা ছিলো ১৩৯৯ হিজরি বা ১৯৭৯ ইং।

এ ক্ষেত্রে আমরা সোভিয়েত বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের পরোয়া করিনি। বরং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে যুদ্ধে নেমেছি। ঐ সময়ে সোভিয়েত বাহিনীর সংখ্যা ছিলো ৩০ লক্ষ। যে বাহিনী উন্নত অস্ত্র সাজে সজ্জিত ছিলো। এটি এমন বাহিনী, যাদের ভয়ে আমেরিকা, ইউরোপ, ন্যাটো জোট নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য শুধুমাত্র অস্ত্র-শস্ত্র ও সরঞ্জামাদি বাবত ৪৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মাদরাসা থেকে আসা এই মুজাহিদ তরুণরা সারা বিশ্বের আতঙ্ক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কী-বা করতে পারবে?

বাস্তব কথা হলো, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন একমাত্র - **السمع والطاعة** - তথা শ্রবণ ও আনুগত্যের আদেশের ভিত্তিতে। তাদের ভরসা এই যে, আল্লাহ আমাদের জিহাদের আদেশ করেছেন, তার আদেশ পালনার্থে আমরা জিহাদে এসেছি (এই ক্ষেত্রে সংখ্যা ও শক্তির আধিক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমাদের নেই)।

বিপরীতে যারা **لا إله إلا الله** এর সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে রাখে, কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্যমতে সে ফাসেক। আর যে সত্তা ছাড়া কোন উপাস্য নেই সে সত্তার বিধান থেকে আমরা কখনো পিছপা হবো না ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ মুমিনদের ও সাহাবায়ে কেরামদের সম্বোধন করে বলেন:

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না”। (সূরা তাওবা, ৯:২৪)

যদি আমরা লক্ষ্য করি যে, এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জিহাদ ছেড়ে দেয়ার উপর কাদেরকে ধমক ও শাস্তির ঘোষণা শুনাচ্ছেন? তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, তারা হলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম। আল্লাহ তাদেরকে **أحب** (যা অধিক প্রিয় হওয়া বুঝায়) এই শব্দের মাধ্যমে সতর্ক করেছেন। কারণ তাদের কতকের নিকট এই তিনটি জিনিস অপেক্ষা আয়াতে উল্লেখিত আট প্রকার অধিক পছন্দনীয় ছিলো। কিছু সাহাবী মক্কা থেকে বের হতে চাইলে এবং হিজরত করতে চাইলে স্বীয় সন্তান, স্ত্রীগণ তাদের পথ আগলে ধরে এবং কাফেররা তাদের নিপীড়ন করে। তখন কতক সাহাবী হিজরত করতে পারেনি এবং ফিতনার ভূমিতে অবস্থান করা নিয়ে তুষ্ট হলো। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন:

الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ

“যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?” (সূরা নিসা ৪:৯৭)

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন:

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না'। (সূরা তাওবা ৯:২৪)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আতিক রহিমাহুল্লাহ বলেন: আয়াতে উল্লেখিত আটটি অযুহাত দেখিয়ে যারা জিহাদ থেকে পিছিয়ে যাবে তারা ফাসেক। তাই **لا إله إلا الله** এর সাহায্য থেকে হাত গুটানো ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্য মুজাহিদদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আয়াতে উল্লেখিত জিহাদ বিমুখতার এই মুসিবত সম্প্রতি সময়ে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। পূর্বের সোনালী যুগে, এমনটা কল্পনাও করা যেতো না। এর উদাহরণ হলো তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত কা'ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাদিস।

সেই যুদ্ধে ত্রিশ হাজার সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলো। মাত্র তিনজন সাহাবী এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। কা'ব বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর যেই দৃশ্য আমাকে সবচেয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে তাহলো; যখন আমি দেখলাম মদীনার অলিতে-গলিতে মাজুর ব্যক্তি কিংবা নিফাকের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ নেই"। এ হাদিস থেকে বুঝে আসে যে, **لا إله إلا الله** এর সাহায্য ছেড়ে দেয়া মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ আমাদেরকে এবং সকলকে এই মন্দস্বভাব থেকে নিরাপদ রাখুন, আমীন।

আল্লাহর রহমতে আমরা জিহাদে বের হয়েছি এবং এই মোবারক জিহাদের ফলাফলও আমাদের সামনে আসতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, বর্তমান মহাশক্তি আমেরিকা। যাদের ব্যাপারে অনেকে আমাদেরকে জুজুর ভয় দেখাচ্ছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আপনারা শুনেছেন যে, উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর সমুদ্র তীর থেকে

আমেরিকা নিজেদের বহর সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। (তখন একবার এমনটি হয়েছে, পরে আবার স্থাপন করেছে)। এটি কার ভয়ে হয়েছে?

এটি আরবের তাগুত শাসক যায়েদ ও ওমরের ভয়ে হয়েছে বলে আপনারা ধারণা করছেন? না, বরং তারা আল্লাহর বাহিনীর ভয়ে কম্পিত হয়ে বের হয়ে গিয়েছে। সকল প্রশংসা, অনুগ্রহ তাঁর জন্য, যিনি শত্রুর অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমরা নিছক উপায় বা মাধ্যম। আমাদের না আছে কোন শক্তি, না আছে কোন ক্ষমতা। আমরা সর্বক্ষেত্রে তারই উপর ভরসা করি।

বর্তমানে মুসলিমদের মাঝে আল্লাহর উপর ভরসার অভাব রয়েছে। আমরা যখন কাউকে বলি; 'ভাই! জিহাদ করতে হবে'। তখন তারা অবাক বিস্ময়ে বলে, 'আপনাদের কী সরঞ্জাম আছে? কিভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে? কতজন সেনা আছে'?

এ ধরণের লোকেরা বস্তুবাদের কলুষিত পরিবেশে অবস্থান করছে এবং বস্তুবাদী উপকরণের কলুষিত পরিমণ্ডলে জীবন যাপন করছে। তাই তারা পরিমাণ ও পদ্ধতি নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করে। আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা করে না। বিগত বিশ বছরে কে আমাদের রিজিক দান করেছেন? যদি আপনারা আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি আপনাদের রিজিক দান করবেন। যেমন পাখিকে তিনি রিজিক দান করেন। তাই পাখি ক্ষুধার্ত অবস্থায় সকালে খাবারের সন্ধানে বের হয়, রাতে পরিতৃপ্ত হয়ে নীড়ে ফিরে আসে।

সাহাবায়ে কেরামকে সমুদ্রপথে হাবশার দিকে হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এখন তারা যদি সমুদ্রে সফরের অভিজ্ঞতা না থাকার ভয়ে আরও কিছু সময় মক্কায় থেকে যেতেন, তাহলে পরিস্থিতি কেমন হতো? অথচ সমুদ্র ভ্রমণ আরবদের জন্য এতো ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো যে, উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর গভর্নরদের এই মর্মে নির্দেশ দিতেন যে, তারা যেন আরবের কাউকে সমুদ্র পথে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বাধ্য না করেন।

হাবশায় হিজরতকারী এই সাহাবীরা না সাঁতার জানতেন, না সমুদ্র সফর সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। কিন্তু তাদের নিকট এত শত প্রশ্ন ছিলো না, তারা এগুলো ভাবতো

না যে, যদি নৌকা ডুবে যায় কিংবা জাহাজ ডুবে যায়, তখন আমরা কী করবো? আমরা তো সাঁতার জানি না, তাই মৃত্যু ছাড়া তো কোন উপায় নেই। এই জাহাজের মালিকরা যদি অন্য অচেনা কোন গোত্রে নিয়ে বিক্রি করে দেয়, তখন আমাদের কী-ই বা করার থাকবে? সত্তরজন সাহাবীর সাথে রয়েছে কিছু নারীও। তো তারা যদি পুরুষদেরকে লোহিত সাগরের তীরে পাকড়াও করে অন্য কোন গোত্রের কাছে বিক্রি করে ফেলে! তারপর হাবশায় পৌঁছালে যদি ডাকাত দল তাদের ধাওয়া করে! হাবশায় পৌঁছার পূর্বে যদি নাজ্জাশী মারা যায় বা নাজ্জাশীর কাছে পৌঁছলে যদি সে মৃত্যুবরণ করে! তাহলে আমরা কেন যাবো? কিন্তু এধরণের বহুবিধ প্রশ্নের তোয়াক্কা না করে তারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে হাবশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

তো একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিই তার আদিষ্ট বিধান বাস্তবায়ন করতে পারে। তাওয়াক্কুল খুবই জরুরী একটি বিষয়। সবসময় অন্তরে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করলে এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক চললে তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। তিনি বলেন:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু’ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেনঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।” (সূরা মায়েদা ৫:২৩)

তো আল্লাহর ভয় ও তাওয়াক্কুল জরুরী। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা রয়েছে। মূসা আলাইহিস সালাম এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাদের অন্তর দুর্বল হওয়ায় তখনকার কুদস এলাকার দাপটশালীদের ভয় পেয়ে তারা বলতে লাগলো-

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ

“তারা বললঃ হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে”। (সূরা মায়েদা ৫:২২)

ফলে এই বিশাল বাহিনী থেকে দু’জনের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন, যারা তাদের সাহস যুগিয়েছে।

আমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহর প্রশংসা আদায় করা এবং এই মহান নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্বেলিত হওয়া। এটা এজন্য যে, পৃথিবীতে অবস্থানরত লাখ লাখ মুসলিমদের মধ্য হতে আল্লাহ গুটি কয়েকশ মুসলিম ভাইয়ের উপর অনুগ্রহ করেছেন। সাথে সাথে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় পাওয়া এবং তাঁর উপর ভরসা করতে হবে। কারণ কেয়ামত পর্যন্ত দালাল খ্রিষ্টান এবং তাদের বোমার সাথে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে। এব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন। গত পাঁচ বছর পূর্বে যখন আমরা আমেরিকা এবং মক্কা-মদিনার দখলদার পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধের আহবান করেছিলাম, তখন থেকে নতুন করে আমাদের লড়াই শুরু হয়েছে।

আল্লাহর প্রশংসা; আমরা সাত মুসলিম ভাই; পুরো বিশ্ব যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুদান থেকে বের করে দেয়ার পর, আমরা আফগানিস্তানে অবস্থান করতে শুরু করি। সেখানে জালালাবাদের ‘তোরাবোরা’ পর্বতে অবস্থানরত অবস্থায় মুসলিম উম্মাহর প্রতি এই বিবৃতি প্রকাশ করছি। আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা এই জিহাদ ও বয়ানের ফলাফল দেখছি। তাই এ পথেই আমাদের সবর ও সাওয়াবের প্রত্যাশা করতে হবে।

যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন, পশ্চাতে ফিরে যাওয়া থেকে বারবার সতর্ক করছি। অন্যথায় আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরতে হবে। কারণ শয়তান মানব দেহের সাথে মিশে আছে। প্রশিক্ষণ শেষে হাঁটু গেড়ে বসে এই হীনম্যন্যতা প্রকাশ করা আদৌ উচিৎ নয় যে, এখন আমি কী করবো? আমার দ্বারা কী হবে? বরং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমি প্রশংসনীয় এক মহান ইবাদতে রত আছি। আল্লাহ তায়ালা যার প্রশংসায় বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

“আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরা হলো সত্যিকার মুসলিম। তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী। (সূরা আনফাল ৮:৭৪)

এই আয়াত মুমিন, মুজাহিদ, মুহাজিরদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য ঈমানের সার্টিফিকেট। কিন্তু শয়তান আপনাকে এই কুমন্ত্রণা দিবে যে, ‘ভাই! তোমার জন্য যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে যাওয়া ভালো’। এ জন্য সুফফার সাহাবীদের কথা বেশী বেশী স্মরণ করতে হবে। তারা সুফফাতে অবস্থানরত সময়ে কোন দিন সকালের নাস্তা পেলে দুপুর ও রাতের খাবার পেতেন না।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন: “মুহাম্মাদের সাহাবীরা ফরয নামাযসমূহে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতো”। এই সাহাবীগণ لا إله إلا الله এর কারণে পরিবার-পরিজনকে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

সাবধান! শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সাবধান! আমরা কখনো এ কথা বলবো না যে, এখানে থেকে আমার কী লাভ? আরে ভাই! কীভাবে বলছেন যে, কোন ফায়দা নেই? বরং আপনি তো মুহাজির, মুজাহিদ, আল্লাহর পথের একজন পাহারাদার। আর এগুলো মৌলিক ইবাদত। শত কষ্ট সত্ত্বেও আসহাবে সুফফার সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর পথে দৃঢ় ছিলেন। বদরের যুদ্ধের বরকতময় মুহূর্তে রাসূলের পক্ষ হতে কোন আহবায়ক এসে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া মাত্রই সুফফার সাহাবীগণ এবং আল্লাহর তাওফীকপ্রাপ্ত বদরী সাহাবায়ে কেরাম সমবেত হলেন এবং মুসলিমদের নিকট সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন।

সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী হলেন হাতেব ইবনে আবী বালতা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন তথ্য প্রকাশ করায় ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার গর্দান উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ওমর! তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন –

'তোমার যেভাবে ইচ্ছা আমল করো, কারণ আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি'"

আল্লাহর রাস্তায় তারা সবর করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে এই উত্তম প্রতিদান দান করেছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, হাতেব ইবনে আবী বালতা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গোলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করে বলছে; "ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাতেব অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। তখন তিনি বলেন, "এটা একেবারেই মিথ্যা কথা। কারণ বদর, হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।"

তাওহীদের পতাকার ছায়াতলে অবস্থানকারীর সংখ্যা যখন কম হয়, তখন সেই কষ্টের মুহূর্তের প্রতিদানও অনেক বেশী হয়। বর্তমানে তাওহীদের পতাকা তলে অবস্থানকারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। পুরো পৃথিবীতে কালিমার দাবীদার মুসলমানের সংখ্যা দু'শ কোটিরও বেশী। কিন্তু আফসোস, প্রত্যেক লাখে গড়ে একজনও জিহাদের জন্য বের হচ্ছে না। গড় হারে যা অনেক কম। কিন্তু সকলের জেনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ আমাদের আমলের মুখাপেক্ষী নন, বরং তিনি চির অমুখাপেক্ষী, চির প্রশংসিত।

কুরআনে কারীমের ভাষ্যমতে একজন মুজাহিদ তো নিজ কল্যাণের জন্যই জিহাদ করে। আমরা যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি, আমাদের উচিৎ, আমাদের আল্লাহ তায়ালার এই মহান অনুগ্রহ উপলব্ধি করে ময়দানে অবিচল ও অটুট থাকা। কারণ ধৈর্যের শেষ মুহূর্তেই বিজয় আসে।

এই জিহাদী আন্দোলন শুরু হওয়ার ফলে, ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলিম ভাই-বোনেরা নির্যাতনের প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছে। আর মুজাহিদদের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করছে। গত কয়েকদিন পূর্বে তারা বলেছে যে, "আমরা আফগানীদের থেকে সাহায্যের অপেক্ষায় আছি।" তাই আমাদের কর্তব্য হলো সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা এবং এই বিশ্বাস রাখা

যে, **لا إله إلا الله** এই কালিমাকে সাহায্য করার মাধ্যমেই চূড়ান্ত সফলতা আসবে। ইনশাআল্লাহ।

আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সংক্ষেপে শেষ কথাটুকু বলে আলোচনার ইতি টানছি। আমরা আফগানিস্তানে মুজাহিদদের সাথী হয়ে গোটা বিশ্বের মোড়ল আমেরিকা, ইসরাইল, অন্যান্য কুফরী রাষ্ট্র এবং কুফরের সমর্থক মুরতাদ রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে হক-বাতিলের এক মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি। সৌভাগ্যবান তো সেই, যে **لا إله إلا الله** এর পতাকার সাহায্য করে এবং আল্লাহর পথে শাহাদাতের তাওফীকপ্রাপ্ত হয়। আমরা আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তিনি অবশ্যই সাহায্য ও শাহাদাতের মাধ্যমে পুরো মুসলিম উম্মাহর উপর অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদের অভিভাবক এবং সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

প্রশ্ন-উত্তর পর্ব:

প্রশ্ন: সম্মানিত শাইখ আবু আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ। আল্লাহ সাক্ষী যে, আমরা ইসতিশহাদী আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী ভাইদের খবর জানতে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি, আপনার থেকে আমরা তাদের খবর জানতে চাই।

উত্তর: আল্লাহর ফযলে তাদের বর্তমান সংবাদ খুবই আনন্দদায়ক। আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহে তাদের এই ইসতিশহাদী হামলা বৈশ্বিক কুফরকে ভীতসন্ত্রস্ত করেছে। আর সকলের নিকট আমার ওসিয়ত; সবাই তাদের জন্য বেশি বেশি দুআ করবেন। আল্লাহ যেন তাদের তাওফীক দেন, তাদের নিশানা যেন যথাযথ হয় এবং তাদের কদমকে অবিচল ও অন্তরকে দৃঢ় করে দেন। কারণ তিনিই এ বিষয়ে কর্তৃত্বশীল এবং তিনিই সক্ষম।

প্রশ্ন: শাইখ উসামা বিন লাদেনের কাছে আমার বার্তা:

শাইখ! আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে আমি আপনার হাতে বায়আত প্রদান করেছি। তার পথে হয়ত বিজয়, নয়ত শাহাদাতের শপথ গ্রহণ করেছি এবং পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয়; সর্বাবস্থায় আপনার কথা শোনা ও মানার উপর বায়আত প্রদান করছি। তবে যে ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা হয় সে ক্ষেত্র ব্যতীত।

আমার এই বাইআত দ্বারা হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলের নিম্নোক্ত হাদিস **التزموا جماعة المسلمين وإمامهم** (তথা; আপনারা মুসলিম জামাআত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরো) অনুযায়ী আমল হবে। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করি, আমার এই বাইআত যেন খালিস হয়। সাথে সাথে আমি সকল মুসলিম ভাইদের আহবান করছি, তারা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর উপর আমল করে, অতিসত্বর মুসলিম ইমামের বাইআত গ্রহণ করে।

উত্তর: আল্লাহ যেন আমাকে সহ আমাদের সবাইকে কবুল করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা করার তাওফিক দেন। আর এটা জানা কথা যে, সাধারণ অনেক বিষয় আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া ছাড়া কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয় না। যেমন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমরা তিনজন কিংবা তার চেয়ে বেশী দলবদ্ধভাবে সফরে বের হবে, তখন তোমাদের একজনকে আমির হিসেবে নিযুক্ত করবে।"

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় শাইখ ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই হাদিসের মধ্যে সাধারণ থেকে সাধারণ বিষয়ের ক্ষেত্রেও জামাতবদ্ধতার প্রতি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত সফরের বিষয়টি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়, তবুও সেখানে জামাতবদ্ধতার প্রতি আদেশ করা হয়েছে।

প্রশ্ন:

১. এক ভাই জানতে চেয়েছেন: পিতা-মাতার গুরুতর অসুস্থতার কারণে জিহাদ থেকে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার হুকুম কী?
২. নিজের উপর আপতিত ঋণ পরিশোধ করার জন্য স্বদেশে ফিরে আসার হুকুম কী?

উত্তর: সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যে হক রয়েছে, তা আদায় এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে কোরআনের যে সকল নুসূস বর্ণিত; তার প্রত্যেকটি হল ফরযে কেফায়া। কিন্তু জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন একে অন্যের কাছে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এমনকি ছেলের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ঋণদাতার অনুমতিরও প্রয়োজন নেই। তবে আপনার কাছে যদি কোন সম্পদ থাকে অথবা আপনি এমন অবস্থায় জিহাদে বের হয়েছেন যে, আপনার কাছে কোন সম্পদ নেই, ইতিমধ্যে আপনি সম্পদের মালিক হয়ে গেলেন, তাহলে আপনি চাইলে স্বদেশে ফিরে আসতে পারেন এবং ঋণ পরিশোধ করতে পারেন। অথবা সম্ভব হলে আপনার ঋণ পরিশোধ করার জন্য কাউকে

উকিল হিসেবে নির্ধারণ করতে পারেন। তবে যদি আপনি এর কোনোটাই না পারেন তাহলে কোন সমস্যা নেই।

জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ জিহাদে বের হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে না। তখন আবশ্যক হল জিহাদে বের হওয়া এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। পূর্বের আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, যদি কোন সন্তান জিহাদে যাওয়ার কারণে পিতা-মাতা কিংবা উভয়ের কারো মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা থাকে, অথবা আপনার মা বৃদ্ধা এবং গুরুতর অসুস্থতার মধ্যে আছেন, কিংবা যদি আপনি তাকে ছেড়ে জিহাদে চলে যান তাহলে সে মৃত্যু বরণ করতে পারে, বা গুরুতর অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, তখনও জিহাদে বের হওয়ার ক্ষেত্রে কোন শিথিলতা করা যাবে না। আর যদি আপনার মায়ের কাছে মাহরামের কেউ উপস্থিত থাকে, যেমন- পিতা, ভাইদের কেউ বা বোনদের কেউ, তাহলে আপনার জিহাদ থেকে ফিরে আশা একেবারেই গাইরে লাজেম। জরুরী নয়।

প্রশ্ন: জিহাদের ভূমিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কেউ যদি স্বদেশে ফিরে যায় এই প্রত্যাশায় যে, নিজ দেশের জিহাদী দলের প্রথম অংশগ্রহণকারী হবেন এমন ব্যক্তির বিধান কী?

উত্তর: সহিহ হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত রয়েছে যে, তিনি বলেন,

إن الله فرض فرائض فلا تضيعواها

“আল্লাহ আমাদের উপর অনেক বিধান ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা সেগুলো বিলুপ্ত করো না।”

জিহাদ ফরজ বিধান। তা আজ প্রতিষ্ঠিত। তাহলে প্রতিষ্ঠিত বিধান ছেড়ে, প্রতিষ্ঠিত নয় এমন বিধানের প্রতীক্ষায় থাকবেন না। হক্ব যেখানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আপনাকেও সেখানে হিজরত করতে হবে।

এরকম হলে মক্কাবাসীদের এ ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকতো যে, আমরা মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ফিরে আসার প্রতীক্ষা করতে

থাকবো এবং গোপনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সহায়তা করবো। এ ধরণের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বাতিল। এ ধরণের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্যাখ্যাকারী শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না। বরং কুফরী রাষ্ট্র থেকে হিজরত করে মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঐ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা আবশ্যক।

বস্তুবাদি মানসিকতার কিছু ভাই একটি প্রশ্ন তোলে। তাদের বক্তব্য হলো, সকল মানুষ জিহাদের জন্য দেশ ত্যাগ করে পুরো দেশকে ফাসিক, পাপাচারদের হাতে ছেড়ে দিবে? এ ধরণের প্রশ্নের উত্তরে আমার মতামত হলো: সাহাবায়ে কেরামদের উপর হিজরত ফরজে আইন হওয়ার সময় তখন কেউ এ ধরণের ভ্রান্ত অযুহাত পেশ করেননি। তাদের থেকে এ কথা শোনা যায়নি যে, আমরা হিজরত করে আবু জাহেলের হাতে দেশ হস্তান্তর করবো? বর্তমানে আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুলবিমুখ ও বিশ্বাসবিমুখ লোকেরাই এ ধরণের উদ্ভট কারণ উত্থাপন করে।

বর্তমানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায় সিক্ত, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের মধ্য হতে দশ হাজার তরুণ জিহাদে বের হলে জিহাদের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যেতো। আর তখন আমরা নিজেরাই ঘোষণা দিতাম যে, হে মুসলিমগণ এখন আর আপনাদের হিজরত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনাদের কারো কি জানা রয়েছে; আমরা বর্তমান মুসলিমদের সংখ্যার হার হিসেবে শতকে কতজনকে চাই?

আমরা প্রত্যেক এক লাখ থেকে মাত্র একজন চাই। কিন্তু কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি কঠোর ও তীব্র ভাষায় চিৎকার করে বলছে; উসামা কাফের, জালিম, তাগুতদের হাতে দেশকে ছেড়ে দিতে চায়। হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় করুন। আমরা লাখে একজন চাই, যারা কুফফারদের ক্ষতি করবে। কিন্তু আজ কত মুসলিম জিহাদে না গিয়ে বাড়ি-ঘরেই মারা যাচ্ছে।

পরিশেষে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রত্যাশা রাখি যে, তিনি আমাদের সকলকে সুন্দরভাবে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দিবেন।

প্রশ্ন: আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, তাঁরই জন্য আমি আপনাদের তথা মজলিসের সবাইকে ভালোবাসি। এই অধিবেশনে শাইখের কাছে আশা রাখি যে,

তিনি আজ আমাদের সামনে বাইআতের অর্থ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন। কারণ আমি আজকে প্রথম এই শব্দ শুনেছি। (আল্লাহ আপনাদেরকে হেফাজত করুন।)

উত্তর: প্রথমত বাইআত দু'প্রকার: প্রথম প্রকারকে **البيعة العظمى** বলা হয়। হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাইআতেরই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

تلزم جماعة المسلمين وإمامهم

অর্থ: "তেমরা মুসলিমদের জামাআত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধর।"

পূর্বে বলেছি যে, এই বাইআত গ্রহণ করা ওয়াজিব। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ইসলামী শক্তিশালী রাষ্ট্র; যেখানে "হুদুদ" কার্যকর হয়। শত্রুকে প্রতিহত করা হয়। আল্লাহর পথে জিহাদ করা হয় এবং শরীয়তের বিধানকে বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে এ ধরণের রাষ্ট্র তালেবানের রাষ্ট্র আর সে আমীর মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর (রহিমাহুল্লাহ)।

দ্বিতীয় প্রকার হলো **البيعة الصغرى** । তা হলো কোন এলাকায় মুসলিমদের বিভিন্ন দলের মাঝে পরস্পর চুক্তি ও অঙ্গীকার হওয়া, এই মর্মে যে; তারা একে অপরকে আমর বিল মা'রুফ, নাহী আনিল মুনকার কার্যকরের জন্য সহযোগিতা করবে। (অবশ্য এই বাইআত **البيعة الكبرى** এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়।)

যেমন ধরুন; কিছু সংখ্যক লোক একটি ঘর নির্মাণের চুক্তি করেছে। তো কারো দায়িত্ব হলো ইট ব্যবস্থা করা। অমুকের দায়িত্ব সিমেন্ট ব্যবস্থা করা। আর আরেকজনের কাট বা লোহার ব্যবস্থা করা। এধরণের চুক্তিতে একে অপরের দ্বারা লাঞ্ছিত হবে না। এমনিভাবে **بيعة صغرى** হলো সফরে আমীর নির্ধারণ করা। যার কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বর্ণনা করেন যে,

إذا خرج ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم

অর্থ: "যখন তোমাদের তিন জন কোন সফরে বের হও তখন একজনকে আমীর বানিয়ে নাও।"

তো এখান থেকে আপনাদের তিনজন কাবুলে যাত্রা করলে আপনাদের উপর আবশ্যক হলো একজনকে আমীর বানানো। কিন্তু এই আমীর, আমীরুল মুমিনীন নয় এবং আমীরুল মুমিনীনের সাথে তা সাংঘর্ষিকও নয়। ইমাম শাতেবী রহিমাহুল্লাহ তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **الموافقات** এ বলেন:

الجهاد من الضروريات والأمير في الجهاد من الضروريات

"দ্বীনের আবশ্যকীয় একটি বিষয় হলো জিহাদ। আর জিহাদের আবশ্যকীয় বিষয় হলো আমির"।

জিহাদ বিহীন দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যেমনটি আমরা বলেছি। পাঁচটি মূলনীতির উপর ইসলামের পাঁচটি রোকনের ভিত্তি। সেগুলো হলো: জামায়াত, শ্রবণ করা, আনুগত্য করা, হিজরত করা ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এই পাঁচটির উপরই পাঁচটি রোকনের ভিত্তি। জিহাদের জন্য আমীর আবশ্যক এবং জামায়াতের জন্যও একজন আমীর আবশ্যক।

সারকথা হলো: সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের উপর মানুষের ঐক্য হওয়া। আর এটি সর্বোত্তম আদিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি সালফে সালেহীনগণ বলেছেন যে, সর্বোত্তম সৎকাজ হলো **لا إله إلا الله محمد رسول الله** এর প্রতি মানুষকে আদেশ করা এবং এর উপর লড়াই করা। সুতরাং আমাদের কাজ সর্বোত্তম সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা মানুষকে **لا إله إلا الله** এর আদেশ করি এবং এরই জন্য লড়াই করি। এই আশায় যে, যখন আমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবো তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবেন। আর এটাই হলো বাইআত। আপনি যদি আরও বেশি জানতে চান তাহলে শাইখুল ইসলামের লিখিত **مجموع الفتوى** এর ২৮ নম্বর খণ্ডের শুরুর অংশ অধ্যয়ন করতে পারেন।

প্রশ্ন: হে শাইখ! আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। এ বিষয়ে আল্লাহই সঠিক জানেন। আমি আমীরুল মু'মীনীনের অনেক স্পষ্ট বিবৃতি শুনেছি ঐ সকল বিজয় সম্পর্কে - যেগুলোর জন্য তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। "জাযাকুমুল্লাহ"। আল্লাহর নিকট আমার দোয়া এই যে, তিনি আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকামে একত্রিত করবেন। খবরগুলো খুবই উত্তম। আমি আশা করি আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করবেন এবং তাঁর দ্বীনের খেদমতের তাওফিক দিবেন।

আমার প্রশ্ন হলো; উজবেকিস্তান কিংবা তাজিকিস্তানের কোন ব্যক্তি যদি তালেবানের সাথে মিলে আহমাদ শাহ মাসউদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই আশায় যে, তালেবানদের বিজয়ের মাধ্যমে তারা তাদের দেশে স্বাধীনতাও অর্জন করবে এবং এতে তাদের ইসলামের কালিমাকেও সাহায্য করার ইচ্ছা রয়েছে। এতে কি তাদের ফরযে আইন আদায় হবে? এখন আমাদের জন্য কোন লড়াই উত্তম? নিজ দেশে লড়াই, নাকি পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে লড়াই?

উত্তর: বর্তমানে অনেক স্থানে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে। সুতরাং ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতেও জিহাদ ফরযে আইন। কাশ্মীর, বসনিয়া এবং তাজাকিস্তানেও জিহাদ ফরযে আইন। এমনকি উজবেকিস্তান ও তুরকিস্তানের মতো ইসলামী দেশগুলোতেও আজ জিহাদ ফরযে আইন। যেমন- একাধিক ফরযে আইন বিধানের কিছু ক্ষেত্রে আমরা জিহাদকে প্রাধান্য দিবো। তেমনিভাবে জিহাদের ফরযিয়াতের মধ্যেও স্থানভেদে পার্থক্য রয়েছে। এক স্থানের জিহাদ অন্য স্থানের জিহাদের উপর প্রাধান্য পাবে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন:

"যখন একাধিক ওয়াজিব বিধান একত্র হয়ে পড়বে তখন তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণটাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।"

সুতরাং ধরে নিন আপনি যোহরের সময় সালাত আদায়ের জন্য গিয়েছেন; যা ফরযে আইন। এমন সময় আপনি শুনলেন যে, আপনার প্রতিবেশী আগুনে দগ্ধ হচ্ছে, অথবা কোন শিশু আগুনের দিকে কিংবা কোন অরক্ষিত কূপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এখনই সে কূপে পড়ে মারা যাবে। তখন এই ব্যক্তিকে রক্ষা করাও ফরযে আইন। আর সালাতও ফরযে আইন। এখানে একটাকে অপরটার উপর

অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। সুতরাং যদিও নামায কিছুটা বিলম্ব হয় তবুও আপনাকে শিশু রক্ষা করাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

বর্তমানে আফগানের ভূমিতে জিহাদ ফরজে আইন এবং এই রাষ্ট্রে জিহাদ করাকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কুফুরের হোতা ইয়াহুদি খ্রিষ্টান জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করা। যাদের নেতৃত্বে রয়েছে আমেরিকা ও ইসরাইল। আর তাদের ক্ষতিসাধন অভ্যন্তরীণ সীমা ছাড়িয়ে বাইরেও প্রভাব ফেলে। প্রতিটি স্থানে তারা আমাদেরকে বিতাড়িত করছে।

বিপরীতে ফিলিপাইনী শাসকের ক্ষতিসাধন ফিলিপাইনে অবস্থিত আমাদের ভাইদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। আর এমনি অন্যান্য দেশগুলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ক্ষতিসাধন স্বদেশ অতিক্রম করে অন্যান্য দেশের মুসলিমদের উপর প্রভাব ফেলে না। কিন্তু আমেরিকা, ইসরাইল, রোম ও ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো মুসলিমদের যে ক্ষতি করে, তা তাদের সীমানাকে অতিক্রম করে দুনিয়াব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে। সুতরাং স্বদেশের বাইরে জিহাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইন হলো আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

“আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে”। (সূরা তাওবা ৯:১২)

সুতরাং তারা ফিরে আসবে না, যতক্ষণ না আমরা তাদের মূল হোতাদের সাথে যুদ্ধ করবো। আমরা আশা করি, আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদেরকে বিজয় দান করবেন।

প্রশ্ন: সম্মানিত শাইখ! আল্লাহ সাক্ষী; আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। আমার প্রশ্ন হলো: যখন আমি জাযিরাতুল আরবে ছিলাম, তখন জানতাম না যে,

তা দখলকৃত ভূমি। এখানে এসে তা জানতে পারলাম। আশা করি আপনি স্পষ্ট করে দেবেন যে, জাযিরাতুল আরব কখন কিভাবে দখল হলো?

উত্তর: এই দখলদারিত্ব এমন স্পষ্ট যে, এ ক্ষেত্রে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। যার সূচনা হয় ১৪১১ হিজরীর মহররমের প্রথম পক্ষে সামরিক বাহিনীর দখলদারিত্বের মাধ্যমে। মহররমের এগারো তারিখে সাদ্দাম কুয়েত দখল করে। আর এরই ভিত্তিতে আমেরিকান বাহিনী জাযিরাতুল আরবে ঢুকে পড়ে, শুধুমাত্র ইয়েমেন ছাড়া। তখন সেখানে আমেরিকার সশস্ত্র সৈন্য সংখ্যা ছিলো পাঁচ লক্ষাধিক। বর্তমানে প্রায় এক থেকে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য রয়েছে সৌদি, কুয়েত ও কাতারে। যার বড় একটি অংশ হারামাইনের দেশ সৌদিতে। এই দখলদারিত্ব কোন প্রয়োজনের তাকিদে নয়। এমনকি আপনি হারাম অঞ্চল মক্কা-মদীনার প্রধান ফটকে আমেরিকান সৈন্যদের দেখতে পাবেন। আর এই কর্তৃত্ব ও দখলদারিত্বের আরও কিছু উপায় রয়েছে।

বাস্তবতা হলো, এসব দেশের কর্তৃত্ব এখন তাদের শাসকদের হাতে নেই। এটা আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য। মূলত এখন সেসব দেশ পরিচালনা করছে আমেরিকা। তারা চাইলে আব্দুল্লাহকে গ্রহণ করে, আবার চাইলে তার পরিবর্তে ফাহাদকে গ্রহণ করে। অর্থাৎ তাদের সন্তুষ্টি আবশ্যক। আপনারা জানেন রিয়াদ এবং খেরাজ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো খেরাজ সংগঠন। যাতে রয়েছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হাজার হাজার আমেরিকান সৈন্য। যেটি প্রায় কয়েক শত কিলোমিটার বিস্তৃত। অর্থাৎ এটা এক সূক্ষ্ম বিষয়। মূলত এটি রিয়াদ দখলদারিত্বের অন্তর্ভুক্ত। সেখানের শাসক গোষ্ঠী কোন কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

একজন অধ্যাপক বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে; কোন এক মসজিদে তাকে মধ্যপ্রাচ্যের সমুদ্র উপকূলীয় দেশগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তিনি বলেন, সমস্ত উপকূলীয় দেশগুলোর অবস্থা ছিনতাইকৃত কাফেলার মতো। তিনি আরও তাকীদ দিয়ে বলেন, সেগুলো দখলকৃত। আর শাসক ও শাসিতরা সবাই বিমানের যাত্রী। আমেরিকানরা হলো ছিনতাইকারী। তারা যাত্রীদেরকে বাধ্য করছে এক সিট থেকে অন্য সিটে যেতে। আর তাদের আমীরকে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমেরিকান ছিনতাইকারীরা বিমানটিকে নিয়ে

যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা জানি না, তারা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি না, বিমানে কতটুকু তেল অবশিষ্ট আছে। আমরা কিছুই জানি না।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমি উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর কয়েকজন নেতার সাথে আলোচনা করেছি। ঐ রাষ্ট্রের সাধারণ নেতা নয়, বরং শাসকদের সাথে আমার আলোচনা হয়েছে। তখন তারা আমাকে সত্যায়ন করে বলেছে, যে বর্তমানে আমরা সবাই ছিনতাইকৃত। যেমনটি আপনারা বলে থাকেন।

فلم المدمرة (দ্যা ডেস্ট্রয়ার মুভি) তে আপনারা আমীর তাল্লাল ইবনে আব্দুল আজিজকে দেখেছেন, সে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তার বাবা ইংরেজদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতো। তাল্লাল ইবনে আব্দুল আজিজ বিভিন্ন জায়গায় এবং লন্ডনের বিবিসি সংবাদে এক টেপরেকর্ডারে বলেছে, যে সংবাদ আমি নিজ কানে শুনেছি এবং রেকর্ড করেছি: 'যদি আমরা আমেরিকাকে বলি তোমরা দেশ ত্যাগ করো, তখন সে দেশ ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়'।

১৪১৯ হিজরীর রমজানে কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুস্পষ্ট ভাষায় একটি মত প্রকাশ করলেন। যার প্রেক্ষাপট ছিলো রমজানে আল জাযিরা কর্তৃক প্রচারিত একটি টকশো। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো, পুরো জাযিরা কি আমেরিকার দখলকৃত নাকি দখলকৃত নয়?

সেখানে একপক্ষ দাবি করলো; তা দখলকৃত। অন্য পক্ষ আমেরিকার পক্ষে অবস্থান নিয়ে বললো: না, তা আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে নেই। তখন কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনসম্মুখে এসে একটি শব্দ বললেন। আরবদের নিকট যার মূল মর্ম হলো; **أحشفا وسوء كيل** (অর্থাৎ একে তো নষ্ট; আবার পরিমাণও কম) আরবদের ভাষায় **حشف** হলো অনেক নষ্ট ও শুকনো খেজুর। যা খেজুরের সর্ব নিকৃষ্ট প্রকার। জনৈক ব্যক্তি অন্য একজনের জন্য **حشف** তথা নষ্ট খেজুরের পরিমাপ করলো, ফলে সে তার থেকে **حشف** ক্রয় করে নিলো। কিন্তু পরিমাপের সময় মাপেও কম দিলো। তখন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় **أحشفا وسوء كيل** । তো এই

মন্ত্রী শ্রোতাদের সামনে এসে বলছে আমি আপনাদের সামনে কিছুতেই **حشف وسوء كيل** একত্রিত করবো না।

অর্থাৎ আমরা দখলদারিত্বকে অস্বীকার করবো না। বরং আপনাদের রাষ্ট্র দখলকৃত। আমার মত হলো - দেশগুলো দখলকৃত। কিন্তু আমি যদি বলি 'দেশগুলো দখলকৃত নয়', সেটাও ঠিক নয়। আর এটা বলাও আমার জন্য উচিৎ হবে না। আমাদের আসলে কোন বিষয়ের কর্তৃত্ব নেই। যদি আমরা আমেরিকানদের বলি; আপনারা এ দেশ ত্যাগ করুন; তখন কাতারের মানচিত্রই মুছে যাবে। তারা সভাসদ বর্গের সামনে এভাবেই বলছে। কিন্তু যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা বিতর্ক করতে পছন্দ করে। মোটকথা উপসাগরীয় সকল রাষ্ট্র দখলকৃত।

আমেরিকা জাযিরাতুল আরব থেকে বিগত দশ বছর যাবত পেট্রোল ক্রয় করে ব্যারেল প্রতি মাত্র নয় ডলারে। অথচ তারা তা ইউরোপে বিক্রি করে প্রতি ব্যারেল ২৩০ ডলার মূল্যে। আর অপারেটিং সিস্টেম এবং তেল রক্ষণাবেক্ষণের কাজেই এই ৯ ডলার ব্যয় হয়ে যায়। অন্য দিকে আমেরিকা এই ৯ ডলার নগদ পরিশোধ না করে বরং তাদের পুরনো বিমান নিয়ে এসে বলে এই ৭০টি বিমান তোমারা ক্রয় করে নাও। তোমাদের অনেক উপকার হবে। অর্থাৎ দখলদারিত্বের আর কোন দিক তারা বাকি রাখেনি। **(ولا حول ولا قوة إلا بالله)**

আলহামদুলিল্লাহ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের রীতি হলো, কেউ যখন পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে ইসলামে প্রবেশ করে তখন সে কুফরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছাড়া ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। মুসলিমদের ক্ষেত্রে সর্বস্বীকৃত বিষয় হলো, তারা মুসলিম। তাই তাদের অযাচিত তাকফীর করা বৈধ নয়। বরং এই তাকফীর খাওয়ারীজদের মাযহাব। সহিহ হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

إذا قال المرء لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما

"অর্থ: কেউ যখন তার ভাইকে কাফের বলে সম্বোধন করে, তখন এই কথাটি তাদের দু'জনের একজনের উপর বর্তায়"।

তো যাকে কাফের বলা হয়েছে হয়তো সে কাফের। আর যদি সে প্রকৃত পক্ষে কাফের না হয়, তাহলে এই কাফের শব্দটি যে বলেছে তার উপরই বর্তাবে। তাই এ ধরণের মাসআলায় বিশেষত নির্দিষ্টভাবে কাউকে কাফের বলা থেকে অনেক সতর্কবাণী এসেছে। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। আর আমাদের প্রতীক্ষিত সাহায্য তো তাঁর পক্ষ থেকেই আসবে। সবর ও তাকওয়া তারই জন্য অবলম্বন করতে হবে। তিনি বলেন:

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

"অর্থ: যদি তোমরা সবর করো, এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তাহলে তাদের চক্রান্ত আপনাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সূরা আলে ইমরান ৩:১২০)

সাবধান! সতর্ক থাকুন! কারণ মানুষ কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কুফুরী করে থাকে। সুতরাং জবানকে হেফাজত করুন। হাদিসে এরশাদ হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তিনটি কাজের জন্য মনোনীত করেছেন;

১. তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে।

২. তার সাথে কাউকে শরীক করবে না।

৩. ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে এবং বিচ্ছিন্ন হবে না।

শাইখুল ইসলাম এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, হাদিসে উল্লেখিত তিনটি উক্তি ইসলামের মূলনীতিগুলোকে শামিল করে নেয়। অর্থাৎ তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো, তার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো, বিচ্ছিন্ন হয়োনা, এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নির্ধারিত আমীরের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষী হও।

সুতরাং আপনাদের উপর আবশ্যক হলো, আপনাদের বিষয়ে এবং আপনাদের ইমামদের বিষয়ে হিতাকাঙ্খীমূলক আচরণ করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা আপনাদের জন্য তিনটি বিষয়কে অপছন্দ করেন।

وكان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতপার্থক্য করা, বেশি বেশি প্রশ্ন করা এবং সম্পদ অপচয় করাকে নিষেধ করেছেন’।

এই দুই প্রকারের নসিহতের মাঝে একটি বড় মিল রয়েছে। আর প্রথম তিনটি হচ্ছে ইসলামের উৎস এবং এর মাধ্যমেই দ্বীন কায়েম হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে দ্বিতীয় তিনটি হলো দ্বীন নিঃশেষ হওয়ার কারণ। সুতরাং আপনারা উল্লেখিত তিনটি বিষয় পরিহার করুন। **قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال** ।

আমরা যখন কারো সাথে কথা বলবো তখন লক্ষ রাখবো যে, সে আহলে ইলম কি না? এবং সে তাকফিরের মূলনীতি বুঝে কি না? যার এ দুটি যোগ্যতা থাকে তার জন্য তাকফিরের বিষয়ে আলোচনা করতে কোন সমস্যা নেই। সাধারণ মানুষ কীভাবে কুফুরি থেকে বেঁচে থাকবে? অথচ আজ সমাজে নেতারা দিনে চল্লিশবার কুফুরি করছে। সুতরাং আপনাদের মধ্যে এমন কে আছে; যে তাগুত বাহিনীকে কাফের ঘোষণা করতে পারবে এবং এ বিষয়টি জাতির সামনে স্পষ্ট করে দেবে।

যাকে কুরআন কাফের বলে আমরাও তাকে কাফের বলবো। আর যখন এই বিধান তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে, তখন আমরা তাকে কাফের ঘোষণা করবো। আর যাকে নুসূসের মাধ্যমে কাফের ঘোষণা করা হয়, তা তো আরও অকাট্য। আর সাধারণ মানুষ যখন ইমান ভঙ্গ করবে, তখন এটা লক্ষ রাখা উচিৎ যে, সে যে কুফুরি করেছে, তা জাহালাতের কারণে নাকি বাধ্যতার কারণে?

এগুলো একেবারে সূক্ষ্ম বিষয়। যেগুলো সাধারণ মানুষ সহজেই জানতে পারে না। আমরা ব্যাপকভাবে গুটি কয়েক শাসকের উপর কুফরের ফতোয়া দিয়ে থাকি। যেমন, সৌদি আরব ও মিসর। কারণ তাদের রাষ্ট্রীয় নীতিমালা একজন ব্যক্তির ইসলাম কেড়ে নেয়। অন্যদিকে তাদেরকে নসিহত ও উপদেশ দেয়া হয়েছে এবং বারবার তাদের সামনে বিষয়গুলো স্পষ্ট করে দেয়ার পরেও তারা আপন অবস্থায় অটল রয়েছে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

আমরা বলবো: এ সকল নিয়ম নীতির কারণে মানুষ আল্লাহর ধর্ম থেকে বেরিয়ে যায়। কিছু ভাই এমন আছে, যারা আগ বেড়ে এমন লোকদেরও কাফের ফতোয়া দেয়, যারা তাগুতের প্রশংসা করে। অনেকেই এটি করে জাহালাতের কারণে। অথচ কোন অবস্থাতেই আপনার জন্য এমনটি করা উচিত নয়। বরং এক্ষেত্রে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ বলেন: যখন কতক আমির ওমারা কুফুরি করে অর্থাৎ **يحكم على غير ما أنزل الله** এর ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা করে; তখন আমি তাদেরকে কাফের ঘোষণা করতাম। কিছু মানুষ তো এমন রয়েছে, যাদের ইলমের ময়দানে কিছু দখল রয়েছে। তারা ঐসমস্ত আমীর ওমারাদের প্রশংসা করতো এবং তাদের পক্ষ থেকে এই ফতোয়াকে প্রতিহত করতো। তাদের উদ্দেশ্যে শাইখ বলতেন, এধরণের ব্যক্তিদেরকে কমপক্ষে ফাসেক বলা হবে। আর ফিসক ও কুফরের মাঝে রয়েছে অনেক বড় দূরত্ব।

সর্বশেষ কথা হলো, আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন এবং এসব বিষয় থেকে বিরত থাকুন। পাশাপাশি আল্লাহর যিকির ও তার কাছে প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করুন। যাতে করে আমরা আল্লাহর সাক্ষাৎ পাই এবং তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। কথা বলার পূর্বে চিন্তা করুন যে, আপনার এই কথার ফলাফল কী? আল্লাহর আনুগত্য ও জিহাদের পথে মেহনত করে যান। যে সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে আপনার গভীর ইলম নেই; সেগুলোর ক্ষেত্রে কখনোই ফাতাওয়া দেয়ার দুঃসাহস করবেন না।

প্রশ্ন: হে প্রিয় শাইখ (আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন)! আমরা আপনাদের নিকট আশাবাদী যে, আপনারা আমাদেরকে এই অঞ্চলের বর্তমান উন্নতি ও অগ্রগতির বিষয়ে এবং আপনাদের দেয়া হুমকি-ধমকির পরে আমেরিকার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত করবেন?

উত্তর: আমাদের এই হুমকি ধমকি কুফফারদেরকে আতঙ্কিত করেছে এবং মুসলিমদের মনোবল আরও বৃদ্ধি করেছে। আমেরিকা বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে ইমারাতের উপর চাপ প্রয়োগ করছে এবং পাকিস্তানও তালেবানদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তালেবান মুজাহিদদেরকে দৃঢ়তা দান করেছেন।

আমেরিকা তার নিজ দেশের পত্র-পত্রিকা এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সংবাদ মাধ্যমগুলোতে এই হামলা নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছে এবং তারা মুজাহিদদের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক হামলার আশঙ্কা করছে। মুজাহিদদের বিপরীতে তারা প্রতিরোধ হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটাই রাশিয়ার উপর নির্ভর করছে। অথচ তারাও জানে যে, তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াই করে সোভিয়েত ইউনিয়নও টিকতে পারেনি।

আজকের তথ্য মতে, আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান ব্যক্তি সমঝোতা আলোচনা করতে মস্কো যাবে। তাদের সমঝোতার আলোচনা মানেই হলো মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সমঝোতা করা। যেমনটি ঘটেছিলো চেচনিয়ার যুদ্ধের পূর্বে। তখনকার সময়ে সর্বপ্রথম আমেরিকা নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান 'সিংদি বারগার' মস্কো সফর করে। এর পর আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী 'ওলিমকোহেন' সফরে আসে। এরপর আসে অর্থমন্ত্রনালয়ের সচিব।

এদের ভ্রমণের পরেই শুরু হয় চেচনিয়ার মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ। আমার ধারণা, তাদের এখনকার সমাঝোতা বৈঠক চেচনিয়া হামলার পূর্বের সমঝোতা বৈঠকের মত। সুতরাং এখানে একটি শক্তিশালী সংঘাত এবং লড়াই আরম্ভ হবে, যার এক পক্ষে থাকবে মুজাহিদগণ, বিশেষত আফগান মুসলিমগণ, আর অপর পক্ষে থাকবে ইজরাইল ও আমেরিকা। আপনারা আল্লাহর নিকট বেশি বেশি দোয়া করুন; হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের মাঝে মজবুত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিন, এবং ইসতিশহাদী কাফেলাকে পূর্ণ সাহায্য দান করুন। এই বরকতময় হামলা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ না আমরা বিজয় লাভ করবো অথবা আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যাবো।

প্রশ্ন: হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি আল্লাহর জন্যই আপনাকে ভালোবাসি। আমার একটা প্রশ্ন ছিল। যে ব্যক্তি মাঠ পর্যায়ের প্রস্তুতি শেষ করেছে, অত:পর এই নিয়তে ইলম অন্বেষণের জন্য নিজ দেশে ফিরে গেছে, যে যখনই ময়দানের কোন প্রয়োজন দেখা দেবে, সে তখনই ফিরে আসবে। এই ব্যক্তির উপর কি এখন জিহাদ ফরযে আইন নাকি ফরযে কিফায়াহ?

উত্তর: হ্যাঁ অবশ্যই, আপনার কি মনে হয় বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন নয়? ঠিক আছে, জিহাদ যদি ফরযে আইন না হয়, তাহলে কেন আমরা ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন স্থানের দুর্বল নারী-শিশুদেরকে ইয়াহুদী-নাসারাদের হাতে নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হতে দেখছি? আর কেনই বা কাফের মুশরিকদেরকে জাযিরাতুল আরবে ঘাঁটি করে বসে থাকতে দেখছি? এগুলো কি প্রমাণ করে না যে, বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন?

বর্তমানে ইলম অন্বেষণের বিষয়ে মানুষ যে সংশয়ে ভুগছে, তা বাস্তবে কোন সংশয়ই নয়। আর আমাদের সালাফদের কাছেও এটি সংশয়ের কোন বিষয় ছিল না। সুতরাং মানুষ যদি একটু ভালভাবে চিন্তা করে দেখে, তাহলে দেখবে এই সকল উদ্ভট প্রমাণাদির কোন অস্তিত্বই নেই।

হে আল্লাহর বান্দা! চলুন আমরা একটু ফাতহে মক্কা নিয়ে আলোচনা করি। আপনার কি জানা আছে কখন ফাতহে মক্কা হয়েছিলো? হ্যাঁ, ফাতহে মক্কা হয়েছিল ২০ শে রমযানে। আর ঐ দিন আবূ সূফিয়ানের সাথে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা সকলে জাতিগতভাবে মুশরিক ছিল। তাদের পূর্বপুরুষ সকলেই মুশরিক ছিল। শিরক তাদের রক্তে-মাংসে মিশে ছিল। ফলে দেখা যেতো ইসলাম গ্রহণ করার পরেও, তাদের কেউ কেউ কোন কার্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে লাত উজ্জার নামে শপথ করতো। তারপর আবার নিজেদের ইমানকে নবায়ন করে আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করতো। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র করা সত্ত্বেও বিজয়ের দিন যখন ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন; "তোমাদের কি ধারণা? আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করবো"?

সকলে বললো, "খুব ভালো। আপনি সম্ভ্রান্ত মানুষ এবং সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে"। সেদিন তাদের এই মিষ্টি কথার একমাত্র কারণ ছিল তরবারি। আর এই তরবারির কারণেই তাদের অন্তরগুলো খালেসভাবে হক চিনেছে। তরবারি এমন এক জিনিস যা কুফফারকে পর্যন্ত হক চিনাতে এবং ইসলামকে জানতে বাধ্য করে।

অতঃপর শাওয়াল মাসে শুরু হয় হুনাইনের যুদ্ধ। এটা তো আপনার জানা আছে নাকি? মক্কা বিজয়ের পর রমজানের আর কদিনই বা বাকি ছিল? বড়জোর ১০

দিন। তার বেশী তো আর নয়। সুতরাং তারা তো চাইলে বলতে পারতো যে, আমরা তো নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাই আমাদের জন্য জরুরী হচ্ছে প্রথমেই উসুলুদ দ্বীন শেখা। কেননা তাদের পূর্বপুরুষ সবাই মুশরিক ছিলো।

কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একবারের জন্যও বলেননি যে, আবূ সুফিয়ান! তুমি এবং তোমার সাথে যারা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা মক্কায় থেকে যাও এবং তোমাদের সাথে প্রসিদ্ধ ফকীহ সাহাবীগণও থাকবেন। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী বিন আবী তালিব, আব্দুল্লাহ বিন উমর এবং যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুরা তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিবেন।

আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও বলেননি যে, তোমরা তোমাদের মতো থাকো, আমি তোমাদের জন্য আমার সাহাবাদের রেখে যাচ্ছি, যারা তোমাদের ইলম শিক্ষা দেবে। কারণ এই মুহূর্তে এটা উম্মতের মূল বিষয় নয় বরং উম্মতের মূল হল **لا إله إلا الله** রক্ষা করা। যেমনিভাবে একজন মানুষ মারাত্মক আহত অবস্থায় তার মূল চিকিৎসা না করে, ছোট খাটো বিষয় দেখাশুনা করা একটি বোকামী কাজ।

ধরুন; আপনি একজন ডাক্তার। এমন একজন রুগীর চিকিৎসা করছেন, যে অধিক রক্তশূন্যতার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কিন্তু আপনি তার উপযুক্ত সেবা না দিয়ে, তার হাতের নখ কাটছেন, অথবা তার ছোট যে আঙ্গুলে রক্তশূন্যতা নেই, সেই আঙ্গুলের আপনি চিকিৎসা করছেন। তাহলে লোকেরা আপনার এই সেবা দেখে কি বলবে? তারা তো অকপটে বলে ফেলবে যে, আপনি তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। তেমনি আজ উম্মাহর অবস্থা হলো তারা আজ রক্তশূন্যতায় ভুগছে অথচ আপনি তাদের আঙ্গুলের মত ছোট বিষয় নিয়ে ব্যস্ত।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় যা আমাদের সকলের জানা আছে যে, হুনাইনের যুদ্ধে বনু সাক্বীফ গোত্রের সৈন্য সংখ্যা ছিল চার হাজার আর মক্কা বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে যুদ্ধের আহবান করা হলো, তখন সাহাবায়ে কেরামের সাথে আরও কিছু নও মুসলিমও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো। আর তাদের সাথে সফওয়ান নামের

একজন রণাঙ্গনে উপস্থিত হন, তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন মূলত মুসলিম বাহিনীর অবস্থা দেখতে।

সেই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পিছনে ফিরে আসার অবস্থা একজন নওমুসলিম এভাবে বর্ণনা করেন যে, বনু সাক্বীফ দক্ষ তীরন্দাজ ছিল। কিন্তু মুসলিমদের অগ্রগামী একটি দল মূল মুসলিম বাহিনীর প্রবেশের পূর্বেই রাতের অন্ধকারে রনাঙ্গণে এসে পড়ে। তখন মুসলিম বাহিনী উপত্যকায় প্রবেশ করা মাত্রই বিভিন্ন স্থানে ওঁৎপেতে থাকা কাফেররা বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। আকস্মিক এমন আক্রমণে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে দৌড়ঝাঁপ আরম্ভ করলো। সর্বশেষ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথে ১০ জন সাহাবীই রনাঙ্গনে ছিলেন। আর বাকী সবাই পিছনে চলে গেলেন। সেখানে যাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অটল ছিলেন, তারা হলেন আবু বকর, ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সহ প্রমুখ সাহাবীগণ। এতো কিছুর পরও জিহাদের প্রয়োজনীয়তা এবং এর নিয়মনীতির ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। আর কেউ এ কথাও বলেনি যে, তারা আলেমও নয় তালেবে ইলমও নয়, আবার দ্বীনের ফাকাহাত অর্জন না করেই জিহাদে নেমে পড়েছে। এখন যদি কেউ এ কথা বলে তাহলে সে আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদআত করলো।

ভাই আমার! আজ আমরা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করছি, আর মনে মনে আত্মতুষ্টিতে ভুগছি যে, আমরাই প্রকৃত হকের পথে আছি! আল্লাহ সাক্ষী, আপনারা ফিকহের সকল কিতাবগুলো খুলে দেখুন, সেখানে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য এমন উদ্ভট শর্তের কোন অস্তিত্বই পাবেন না।

আরেকটা ঘটনা শুনুন: উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক মুশরিক আসলো। নাম তার উসাইরিম। যুদ্ধ শুরু হলে সে অধীর আগ্রহ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন; ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি প্রথমে লড়াই করবো নাকি ইসলাম গ্রহণ করবো? তিনি প্রতি উত্তরে বললেন: তুমি আগে ইসলাম গ্রহণ করো, তারপর লড়াই করো। তিনি চাইলে বলতে পারতেন যে, তুমি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করো অতঃপর ইলম অন্বেষণ করো। কিন্তু তিনি তা বলেননি। বরং ইসলাম গ্রহণের পর সরাসরি

লড়াইয়ের আদেশ করলেন। তাহলে আপনারা এ শর্ত কোথা থেকে নিয়ে এসেছেন?

অতঃপর সে লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার আমল খুবই অল্প কিন্তু তার প্রতিদান অনেক। সুতরাং যে সংশয় লোকদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তা থেকে সাবধান হোন!

প্রিয় ভাইয়েরা! এ বিষয়ে তো তাবুক যুদ্ধের ঘটনা আরও বিস্তৃত। আর সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি তো আরও একধাপ এগিয়ে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাদের নিকট বাহিনী পাঠালেন। পরবর্তীতে তারা আবার ইসলাম গ্রহণ করে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পর খলিফা হন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। তিনি তখন সকল গভর্নরের কাছে চিঠি পাঠালেন যে, আপনারা সর্বস্তরের লোকদেরকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পারস্য এবং রুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠান। অর্থাৎ অশ্বারোহী, খতিব, কবি, পরামর্শদাতা জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ, সাহসী বীর, এক কথায় সকলকেই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। মুসলিমরা হলো জিহাদী জাতি।

ইলমের উদ্দেশ্য হল - আমল করা। আর আমল ছাড়া ইলম অন্বেষণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আজ আমরাও আল্লাহর অনুগ্রহে ইলমের অনুসরণই করছি। ইলম যদি না থাকতো তাহলে আমরা জানতেই পারতাম না যে, জিহাদ আমাদের উপর ফরযে আইন। ইলম আমলের জন্য কাম্য কিন্তু ইলমই মূল লক্ষ্যবস্তু নয়। ইলমই আমাদের শরিয়াতের বিধি বিধানগুলো সঠিক ভাবে পালন করার প্রতি নির্দেশনা দিয়ে থাকে। আর এই ইলমের মাধ্যমেই আমরা আজ আল্লাহ যেভাবে তার ইবাদত করার আদেশ করেছেন সেভাবে ইবাদত করতে পারছি।

প্রশ্ন: শাইখ! জাযিরাতুল আরবের দখলদারদের সাথে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আপনার মতামত কি? আমরা যদি তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইচ্ছা করি তাহলে কি আপনি আমাদের সঙ্গ দেবেন?

উত্তর: আমি তো বলি এটা একটি বিরাট ইবাদত। আর আল্লাহর নৈকট্য অর্জনেরও উত্তম উপায়। আর ক্রুসেডারদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমি থেকে বের করে দেয়া এবং এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরযে আইন। কারণ আল্লাহর আদেশে এই ভূমিকে কাফির মুশরিকদের জন্য হারাম করা হয়েছে। কোরআনে মাজীদে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়”। (সূরা আত তাওবা ৯:২৮)

আবার এবিষয়ে অনেক সহীহ হাদিসও আছে। যেমন বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে: ইবনে আব্বাস (রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় বলেছেন; তোমরা মুশরিকদেরকে জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কাহতান এবং আদনান গোত্রের মুশরিকদেরকে বের করে দেয়ার আদেশ করেছেন। সুতরাং আমরা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিব। যদিও সেখানে তারা জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানকার আলো-বাতাসে বেড়ে উঠে। কারণ এটা এমন এক বরকতময় ভূমি যেখানে কোন মুশরিকদের কোন ঘাঁটি থাকতে পারেনা। যদিও সে আদনান ও কাহতান গোত্রের হয়।

সিন্দ, হিন্দ, চিন, জিনজীয়াং, পশ্চিম, পূর্বের সকলেই সেখানে অবস্থান করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, **لا إله إلا الله محمد رسول الله** এই কথার সাক্ষ্য দিতে হবে। অন্যথায় তাদেরকে এই বরকতময় ভূমি থেকে বের করে দেয়া হবে।

কিন্তু আফসোস! বর্তমান তাগুত সরকার ইসলামের শত্রু ইহুদী নাসারাদের সেখানে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে। সুতরাং এদের সাথে লড়াই করা কিংবা এদেরকে এই ভূমি থেকে বের করে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজে আইন। আশা রাখি, ভাই ভাইয়ের বিপদে পাশে দাঁড়াবে। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মাফিক প্রস্তুতি নিন। ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের সঙ্গ দিবো এবং আপনাদের সাথে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।

প্রশ্ন: (ইংরেজি ভাষাভাষী এক লোক প্রশ্ন করলো) আহমদ শাহ্ মাসউদের বিরুদ্ধে তালেবান যে জিহাদ শুরু করেছে, এই জিহাদ কি ফরযে কিফায়া নাকি ফরযে আইন?

উত্তর: বিভিন্ন কারণেই আমি এই জিহাদকে ফরযে আইন বলি। কারণ পৃথিবীর বুকে বর্তমানে আফগানই হলো একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র। সুতরাং এই ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো শক্তি অর্জন করে বিশ্বময় ইসলাম ছড়িয়ে দেয়া। কিন্তু আহমদ শাহ মাসউদ এই পথের সবচেয়ে বড় বাঁধা। এমনকি তার মাঝে কিছু ঈমান ভঙ্গের কারণও পাওয়া গেছে।

ইউরোপের পার্লামেন্টে এক ফ্রান্সিস কর্মকর্তা তার সম্পর্কে বলেছে, ইউরোপের পক্ষ হয়ে আহমদ শাহ মাসউদ সর্ব প্রথম মৌলবাদ দমনের ছক তৈরি করে। ইউরোপের পার্লামেন্টের একজন ফ্রান্সিস কর্মকর্তা এভাবেই তার সম্পর্কে মন্তব্য করে।

শাহ মাসউদের মুখ থেকে একটি কুফুরী বাক্যও শুনা যায় যে, সে বলে, তালেবানরা নারী পুরুষকে সমান অধিকার দেয় না। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

“এক পুত্রের জন্য দুইজন কন্যার অংশ পরিমাণ অংশ সাব্যস্ত হবে”। (সূরা নিসা ৪:১১)

তার বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরযে আইন হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, আফগানিস্তানের ক্ষমতাকে স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী করা, যেখান থেকে আমরা বিশ্ব কুফফার শক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যে লড়াই করবো।

প্রশ্ন: মুহতারাম শাইখ! U.S.S কোল (ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ) কেন ধ্বংস করা হলো?

উত্তর: U.S.S কোল ধ্বংসের ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়ার পর ইয়েমেনের কিছু ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাদেরকে আমি এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা যে উত্তর দিলেন তাদের অধিকাংশের উত্তর এমনই ছিলো যে, এই সংবাদটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, সৌদি আরবে গিয়েও আমি এই তথ্যই পাবো।

উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে গিয়ে আমি এই সংবাদটিই পেয়েছি এবং যেখানেই যাবো এই সংবাদটিই পাবো। U.S.S. কোল ধ্বংসের প্রভাবও ছিলো অনেক বড়। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যারা এই মহান হামলা পরিচালনা করেছেন আল্লাহ যেন তাদেরকে কবুল করেন। এই ঘটনার মাঝে উম্মাহর জন্য কল্যাণ রাখেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে সাগরের যুদ্ধসমূহের মাঝে এটিও একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ যেখানে শুধুমাত্র মিলিয়ন ডলার নষ্টই হয়নি বরং এই বিষয়টা আমেরিকার রাজনৈতিক অঙ্গনে অভ্যন্তরীণ ও প্রকাশ্যভাবে বড় ধরণের প্রভাব ফেলেছে। আমেরিকা ১৫০০ মিলিয়ন মানুষের দেশ চীনকে আতঙ্কিত করে রাখতে চেয়েছিলো। কিন্তু চীন তাইওয়ান থেকে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে চাচ্ছে। এই দেখে আমেরিকা আরও উত্তেজিত হয়ে চীন সাগরে বিধ্বংসী এই জাহাজগুলো প্রেরণ করে, যেন চীন তাইওয়ান থেকে সরে আসে। U.S.S কোল ধ্বংসের পর, আমেরিকা মুজাহিদদের এই কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে শক্তিশালী প্রমাণও পেয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা এটা জানতে পেরেছি।

কিন্তু বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো; এরপরও তারা বলছে যে, U.S.S কোল ধ্বংসের অনুসন্ধানের রিপোর্ট প্রকাশিত হতে কয়েক বছর লাগবে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, মুজাহিদরা যে তাদের উপর আঘাত হেনেছে এই বিষয়টি তারা

বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ করতে চাচ্ছে না। কারণ বিষয়টি বিশ্ববাসীর নিকট প্রকাশ করাটা তাদেরই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারপরও আমরা কিছু আলামত প্রকাশ করেছি। যাতে আমেরিকা এই বিষয়টি একেবারেই এড়িয়ে যেতে না পারে।

তাই জাযিরাতুল আরবের এক প্রসিদ্ধ চ্যানেল তাদের রিপোর্টে প্রকাশ করে যে, উসামা বিন লাদেন বলেন; এটি আমেরিকার উপর আঘাত হানার উত্তম একটি মাধ্যম। অথচ আমেরিকা এই বিষয়টা এড়িয়ে গিয়ে বলছে: এই রিপোর্ট প্রকাশ করতে আরও কয়েক বছর সময় লাগবে। "হায়ত" নামক পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে "উসামা বিন লাদেন আমেরিকার U.S.S. কোল ধ্বংসের সংবাদ শুনে শুকরিয়া হিসেবে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন" এই শিরোনামে একটি বিস্তারিত তথ্য পেশ করে। এরপরও যেই সকল ভাই এই মহান হামলাটি পরিচালনা করেছিলো তাদের প্রশংসায় আমি একটি কবিতা পাঠ করেছি, যা জাযিয়াতুল আরবের প্রসিদ্ধ চ্যানেল প্রকাশ করেছে।

কবিতা:

نحمد الله يوم ربي نصرنا

يوم دمرنا على البحر كول

. الله أكبر

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি আজ আমাদের সাহায্য করেছেন।
যিনি আমাদের আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করার তাওফিক দিয়েছেন।

শাইখ আবু হাফস এর একটি কবিতাও আমি পাঠ করেছি। সেটি হলো,

وإخوانكم في الشرق شدوا سروجهم

وكابل شدت والنجائب ضمرُ

ونجد بها هب الشباب مجاهداً

وفي عدنٍ هبوا وشدوا ودمروا

مدمرة يخشى أولوا البأس بأسها

تزيدك رعباً حين ترسو وتبحر

আপনাদের মধ্যপ্রাচ্যের মুজাহিদ ভাইয়েরা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েছে।
যেমন উটের ছাওয়ারী তার জিনপোষ বেঁধে নেয়।
যে প্রস্তুতি জ্ঞানী লোকদের পর্যন্ত হতভম্ব করছে।
এবং এর মাধ্যমে জিহাদের প্রতি তীব্র বাসনা সৃষ্টি হয়েছে যুবকদের।
আদন শহরে তারা চূড়ান্তভাবে আক্রমণ করেছে এবং দুশমনদের ধ্বংস করে দিয়েছে।
তা ছিলো ধংসাত্মক আক্রমণ যা দুষমনদের আন্তরে ভীতি সৃষ্টি করেছে।
যখন আপনি এই চিত্র নিয়ে ভাববেন আপনি নিজেই আঁতকে উঠবেন।

অবশেষে এই U.S.S কোল ধ্বংস হওয়ার সংবাদটা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু আব্দুল বারি আতওয়ানের সাথে শেষ সাক্ষাতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। প্রথমদিকে ফয়সাল কাসেম কঠিনভাবে আমাদেরকে এই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করেন। তিনি বলেন: আমরাই U.S.S. কোল ধ্বংস করেছি। আব্দুল বারী আতওয়ান ও পুরো বিশ্ব এই সংবাদ জানে যে, আমরা এই হামলা করেছি। যার কারণে আমেরিকা ভয়, দুর্বলতা ও আশংকার মাঝে রয়েছে। এগুলো সবই হলো আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ।

মানুষ যেমন মৌমাছির চাকের নিকট ঘেঁষতে ভয় পায়, তেমনি আমেরিকা আজ আমাদের নিকট ঘেঁষতে ভয় পাচ্ছে। কারণ আমাদের সকল কাজই হলো আত্মউৎসর্গমূলক কাজ। আমি এই বিষয়টিকে মৌমাছির সাথে দৃষ্টান্ত দিয়েছি। সিংহের সাথে দিতে পারতাম। কারণ সিংহ আকার আকৃতিতে মৌমাছির চেয়েও বড়। কিন্তু সিংহ যদিও মৌমাছির চেয়েও বড়, তবে সিংহ যদি কখনো মৌমাছির মৌচাকের দিকে যায়, তাহলে সে অবশ্যই তাদের আক্রমণের শিকার হবে। যার প্রতিটি কাজই হলো আত্মোৎসর্গমূলক। আক্রমণকারীর শরীরে সে হুল ফুটাবেই।

সে কিছু দূর উড়ে যেতে না যেতেই সে মৃত্যুবরণ করে। আর মৌমাছি সিংহের উপর আক্রমণ করে, তখন সিংহ বড় শরীরবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পালিয়ে যায়।

মানুষ কিংবা অন্য কোন জাতি যদি তার প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ করতে চায়, তখন সে যতই সাহসী হোক না কেন তার প্রতিপক্ষ যদি মৌমাছির মতো তার উপর আক্রমণ করে, তখন সে পিছনে ফিরে পালাতে বাধ্য হবে। তাই তো আজ আমেরিকা মৌচাকের (ইসলামী বিশ্বের) কাছে ঘেঁষতে ভয় পাচ্ছে। আর বলছে, আমরা যদি তাদের আমন্ত্রণ জানাই, তবে তারা আবার আমাদের কাছে আসবে!। কী হাস্যকর।

ছোট ছোট আক্রমণের মুখোমুখি হয়েই তারা আতংকিত। আমাদের ভূখণ্ডে এসে আমাদেরকে উত্তেজিত করতে তারা ভয় পাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা হলো আমেরিকা তাদের অস্তিত্বের সংকটে পৌঁছে গেছে। এখন পরিস্থিতি এমন যে, হয় আমরা থাকবো, না হয় তারা থাকবে। (বিইজনিল্লাহ আমরাই থাকবো)। এখন তারা আমাদের সাথে সন্ধি করতে চাচ্ছে। তাই তারা (কেনিয়ার রাজধানী) নাইরোতে দূত পাঠিয়েছে যে, আমরাও আপনাদের উপর আর আক্রমণ চালাবো না। আর আপনারা আমাদের উপর আক্রমণ চালাবেন না এবং অতিরিক্ত পাওনা হিসেবে শাইখ উমর আব্দুর রহমানকে ছেড়ে দেয়া হবে।

সুতরাং ভাইয়েরা! আপনারা নিজেদের মাঝে ইসতিশহাদী বিষয়ে আলোচনা করুন। নিজেদেরকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন। প্রথমে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করুন। এই বিষয়টিকে সহজভাবে দেখুন। কঠিনভাবে নয়। কারণ আপনি শুধু আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসার জন্যই এসেছেন। সুতরাং আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট। আর আমরা আল্লাহর উপর কাউকে প্রাধান্য দিবো না।

****